[স্ব] নীরা গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৭

নলেজ হোমের স্বত্বাধিকারী এ. এম. খান মজলিস কর্তৃক
১৪৬, গভর্ণমেন্ট নিউমার্কেট, ঢাকা-৫ থেকে প্রকাশিত
এবং বাংলা একাডেমী প্রেস, বর্ধমান হাউস,
রমনা, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু গুণ

স্কেচ : শিল্পী কালিদাস কর্মকার

দাম :

সূচীপত্র

উৎসর্গ

আমাদের অনাগত সন্তানের প্রতি :

পাথরে পাথর ঘষে পৃথিবীর প্রথম আগুন
জ্বেলেছিল আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা, সেই কবে—
তারপর থেকে অগ্নি মানুষের হৃদয়ে বসেছে।
হৃদয়ে হৃদয় ঘষে দু'জন পাথর যখন মিলেছি
জানি, সেই অনিবার্য অগ্নির মতন তুমি হবে।

তোমার পিতার পৃথ্বী নিষ্কণ্টক স্বর্গলোক নয়,
এখানে নিষ্পাপ শিশু মাথা কোটে পাথরের বুকে—
এখানে অমৃত নেই, মাতৃস্তন্যে গোক্ষুরের বিষ।
তাইতো তোমার জন্যে আমি রাখি আমার আশীষ :
'তুমি হও বৃষ্টিধারা তৃষাতুর চাতকের মুখে।'

স্বপ্নভ্রষ্টক্ষতবিশ্বে তবুও মঙ্গল-দীপ জ্বলে,
আসন্ন বিপ্লবে তুমি আমাদের সাথী হবে বলে।
যেখানে পৃথিবী অন্ধ, অসুরেরা হিংসায় উন্মত্ত—
সেখানে সুন্দর দ্রোহ, জেনো সংঘর্ষ সেখানে সত্য।

নীরার বাগান

যতো না এঁটেল মাটি তার চেয়ে বেশি ছিলো বালি।
এই বালির ভিতরে ধীরে-ধীরে জীবনের ফুলকে ফোটানো
কাজটা সহজ ছিলো না মোটেও।
তার জন্য শ্রম চাই, চাই নিষ্ঠা, চাই ভালোবাসা,
চাই প্রয়োজনমতো জল-আলো-হাওয়া।
ভয় ছিলো যদি বালিভারাক্রান্ত এই মাটির ভিতরে
সযত্নপ্রোথিত গাছগুলো ম'রে যায়।
যদি বালির ভিতরে পরাজিত হয় মাটি, যদি পণ্ড হয় শ্রম।
যদি না অংকুরিত হয় বীজ, যদি না প্রস্ফুটিত হয় পাতা
প্রাণস্পর্শে যদি না জাগ্রত হয় ফুল।

ভালোবাসা জয়ী হলো। বালি পেলো মাটির মমতা,
গাছের শিকড় পেলো বিশ্বস্ত আশ্রয়। দেখতে-দেখতে
বসন্তের দুরন্ত সবুজ ছড়িয়ে পড়লো সবখানে।
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গশেষে যেন কোনো গুহার আঁধারে
প্রবেশিল প্রভাত পাখির কলতান।
কোদাল ও খুরপির মুখে চুমো খেয়ে জয়ী হলো নীরার
বাগান।
তারপর থেকে রাতের আঁধারে কুঁড়ি, দিনে রাঙা ফুল।
যেদিকে তাকাই দেখি কৃষ্ণগাঁদা, কসমস আর ডালিয়ার
প্রাণবন্ত হাসি।
বুঝি তাই আজও আমি পৃথিবীকে এতো ভালোবাসি।
বলি চিরপুষ্পময় হে পৃথিবী আমাকে আবৃত করো,
আমাকে আবৃত করো, আমাকে আবৃত করো তোমার কুসুমে।
আমার অক্লান্ত শ্রমে এ-বাগান হয়নি নির্মিত জানি
আমি শুধু তার বন্দনার হার ভালোবেসে করেছি রচনা বারবার,
সেই অধিকারে ফুলের ভিতরে আজও মানুষের স্বর্গ টেনে
আনি।
বলি বালিতে ফুটেছে ফুল দেখে যাও স্বর্গের দেবতা,
ভালোবাসা কি ফুল ফোটাতে পারে দেখো।

দেখো মানুষের নিষ্ঠা কতো কোমল সুন্দর হতে পারে।
এখন বসন্ত নেই, নেই ফুল বাগানের সেই অনুকূল ঋতু।
অপসৃত কৃষ্ণগাঁদা কসমস আর ডালিয়ার হাসি,
দৃঢ় ঋজু বলবান সূর্যমুখীটিও অগ্নিবাণে মৃত।
এখন জমেছে ধুলো পুষ্পহীন গাছের গোড়ায়।
এই পুষ্প প্রতিকূল গ্রীষ্মে আবার নীরার কাছে যাই, বলি,
ফুল দাও হে ফুলের শ্রমিক—এ গ্রীষ্মের যোগ্য ফুল দাও।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি বাগানের শেষ প্রান্তে পাপড়ি মেলেছে
এক অপরূপ মুগ্ধ কলাবতী, রক্তেভেজা লালসালু—
যেন মিছিলের অগ্রভাগে বিপ্লবের আসন্ন পতাকা।

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে—
'কখন আসবে কবি ?'
এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
অথচ তখন প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেছে যখন গম্ভীর মুখে
কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তাহলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি ?
তাহলে কেমন ছিল শিশুপার্কে, বেঞ্চে-বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি ?
জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত কালো হাত।
তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ...।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে—আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান—এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু ধু মাঠ ছিল দূর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।

কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে এই মাঠে ছুটে এসেছিল
কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক,
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্নমধ্যবিত্ত, করুণ কেরাণী, নারীবৃদ্ধ বেশ্যা ভবঘুরে আর
তোমাদের মতো শিশু পাতা কুড়ানীরা দলবেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে তার জন্য কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের।
'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা—
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি :
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।

সেই যুবকেরা কোথায়

দেখতে দেখতে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলো চোখ। মনে হয়েছিলো
বাসের গায়ে লেখা
কথাগুলিই ঠিক—'সময়ের চাইতে জীবনের মূল্য অনেক বেশী।'
আমরা চুপ করে বাসের ভিতরে তাই চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে কেউ বসে,
কেউ দাঁড়িয়ে যে যার মতো
অপেক্ষা করছিলাম যে যার গন্তব্যের। বাস থামছিলো পথে পথে
ইচ্ছেমতো।
এর গতি কখনও তিরিশের কোঠা ছাড়েনি। এরকম শম্বুকগতিতে
বীতস্পৃহ
যাত্রীদের কেউ মুখফুটে যদিওবা বলতে চেয়েছে 'এই ড্রাইভার
একটু জোরে চালাও না ভাই'
প্রতিবারই বাধা হয় দাঁড়িয়েছে ঐ লাল উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা
নীতিবাক্যখানি।
যদি দুর্ঘটনা ঘটে ? তার চেয়ে এই ভালো, ঠুকঠুক করে চলছে তো
তবু। চলুক।
সময় আর এমন কী মূল্যবান, জীবন যেখানে বিপন্ন ? সন্দেহ কি,
যাত্রীদের প্রতি
বাস চালকের সীমাহীন মায়া। কম নয় আমাদেরও কিছু।
একটাই তো জীবন আমাদের।

এভাবেই চলছিল আমাদের বাস মধুপুরের গড়ের ভিতর দিয়ে।
এমন সময় আসন্ন সন্ধ্যার মুখে বন থেকে বেরিয়ে এলো একদল
সশস্ত্র যুবক, এবং
সরাসরি এসে উঠলো আমাদের বাসের ভিতরে
'এই ড্রাইভার জোরসে চালাও'
তাড়া দিয়ে ঘাড় দেখে বললো একজন। স্পীড বাড়লো ত্রিশ থেকে
চল্লিশ-পঞ্চাশে।
যাত্রীদল ছুটন্ত বাসের তালে তালে ঠক ঠক করে
কাঁপতে লাগলো ভয়ে—

বুঝি এই উল্টে পড়ে গাড়ী। কিন্তু যুবকেরা অসন্তুষ্ট—'আরো
জোরে।' 'আরো জোরে।'

করজোরে ড্রাইভার বললো,' ক্ষমা চাই ভাই, আর পারি না,
আর পারি না।'
ভীত যাত্রীদল জীবনের ভিক্ষা মাগলো ঐ যুবকদের কাছে।
জীবনের মূল্য নিরূপক
সেই লাল নীতিবাক্যটির উপরে টর্চের আলো ফেললো একজন।
সঙ্গে সঙ্গে একটি বুলেট এসে বিদ্ধ করে বাক্যটিকে কিছু
শাস্তি দিল। তখন
বাসের গতি মুহূর্তে ছাড়িয়ে গেল ষাট থেকে সত্তরের কোঠা।
যেন পংখীরাজ।

না কোনো দুর্ঘটনা নয়। নগরীর উপকণ্ঠে এসে যুবকেরা বাস
থেমে নেমে গেলো দ্রুত।
যাবার সময় সবাইকে সবিনয়ে বলে গেলো 'ধন্যবাদ।' নির্ধারিত
সময়ের মধ্যে তারা
পৌঁছে গেছে আপন গন্তব্যে, তাই হাসিমুখ। ঐ যুবাদের
বদৌলতে আমরাও সেদিন
নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম ঢাকায়।
আজ, আট বছর পর সেদিনের সেই যুবাদের কথা মনে পড়ে খুব।
ওরা এখন কোথায়?

লেনিন বন্দনা

মানবের বাসযোগ্য পৃথিবী ছিল না পৃথিবীতে।
অথচ মানুষ ছিল, ছিল উর্বর মৃত্তিকা,
ছিল পাহাড় অরণ্য নদী, সীমাহীন সমুদ্র আকাশ।
ছিল ধর্ম, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস। তবু
মানবের বাসযোগ্য পৃথিবী ছিলনা পৃথিবীতে।
ছিল দানব দাপটে কম্পমান এক মানব সমাজ,
যেন মরূদ্যানহীন কোনো মরু।
মহামানবেরা এসেছেন দলবেঁধে মানুষের মুক্তিবাণী নিয়ে।
তাঁরা বলেছেন 'ভলোবাসো।'
'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।' তাতেই কল্যাণ, শান্তি।

আমরা তাদের কথা মেনেছি মন্ত্রের মতো।
তাই ভালবেসে ঝড়ে জলে কর্ষণ করেছি ভূমি,
বুনেছি স্বপ্নের বীজ, ফলেছে ফসল।
নিয়ে গেছে ভূস্বামীর দল। দেখেছি চুপটি করে।
আমার ক্ষুধার কথা ক্ষণিকের তরে স্মরণে রাখেনি কেউ।
ভালবেসে ভাঙিয়া পর্বত নির্মাণ করেছি পথ অহোরাত্র শ্রমে,
সভ্যতা বেড়েছে ক্রমে ক্রমে। সেপথে আসেনি মুক্তি।
পরদিন তৈরীপথ ধরে আমাদের অন্তঃপুরে
প্রবেশ করেছে এসে শোষকের রথ কেড়ে নিতে শেষ শস্যকণা।
যখন বলেছি প্রভু 'অনেক দিয়েছি আর তোমাকে দেবো না।'
তখনই তাদের হাতে ঝলসে উঠেছে অস্ত্র—
যেন ক্রুদ্ধ দংশন উদ্যত শত নাগিনীর ফণা
ঘিরেছে আমাকে অসহায়।

নিরুপায় অনাথের অশ্রুসিক্ত চোখে পাথরে কুটেছি মাথা।
প্রতিকারে অপারগ যে নিষ্ঠুর প্রাণের দেবতা
সুচতুর ছলনায় ফিরিয়ে রেখেছে মুখ, তাকেও বেসেছি ভালো।
তারপর বিশ্বাসে পড়েছে ভাটা ভেতরে জমেছে ঘৃণা
নতুন জীবন স্বপ্ন কুঁড়িমেলে ফুটেছে হৃদয়ে—

তাই সত্য কিনা
সে কথা জানার আগে কতো প্রিয় সময় ফুরালো পৃথিবীর।
তারপর তুমি এলে।
সেটা কোন্ সাল ?
হোকনা তা যেকোন বছর—এই যে বিগত মহাকাল
আছে অনাগত কালে মুখ গুঁজে
তার পিঠে, চাবুকের ক্ষত দগ্ধ পুঁজে
তুমি এসে ভালবেসে করেছো চুম্বন।
ওটাই স্মরণে থাক মানুষের।

কোথায় তোমার জন্ম ?
হোকনা তা সিমবির্স্ক কিম্বা কোনো ভলগার তীরে
তোমার জন্মের অর্থ বদলে দিয়েছে এই জরাজীর্ণ দীর্ণ
পৃথিবীরে— ওটাই স্মরণে থাক মানুষের।

ব্যক্তিবিশেষের স্তুতি অর্থহীন তোমার দৃষ্টিতে জানি।
জানি তোমার বিশ্বাস অমোঘ সত্যের মতো
ধাবমান মহাবিশ্বে, মহাকাশে, মহাকাল মাঝে।
দানবিক গ্রন্থিজাল ছিন্ন করে মানবকল্যাণ স্বপ্ন
রচিয়াছো তুমি। পুরাতন পৃথিবীর পরে
সৃজিয়াছো নববিশ্ব মানবের বাসযোগ্য করে।

মার্কসের দ্বান্দ্বিক দর্শন যে সত্য ধারণ করে
আপনার মাঝে ছিল আত্মলীন তত্ত্বের আকারে
তুমি তার শ্যামল স্বপ্নের পদতলে
বিছিয়ে দিয়েছো এনে পৃথিবীর অকর্ষিত মাটি।
মরুতে ফুটেছে পদ্ম, তুমি তার জীবন্ত মৃণাল।
হোক না তা দূরে কোনো ভলগার তীরে
তোমার বিপ্লব বাণী বদলে দিয়েছে জানি
অন্যায় আকীর্ণ পৃথিবীরে।
ওটাই স্মরণে থাক মানুষের।

আমি অতি হীনমতি বাংলার বিপন্ন চারণ,
তোমাকে স্মরণ করে রক্তের অক্ষরে লিখি
তোমার প্রশস্তি গাথা।
যেমন প্রশস্তি গাই হেমন্তের চাঁদে ধোয়া নীল আকাশের
যেমন প্রশস্তি গাই রাত্রিশেষে রক্তিম সূর্যের
তেমনি তোমার নাম ভালবেসে লিখি প্রতিদিন ঃ
ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

ফুলের বন্দনা

যতো গাছ ততো ফুল
যতো ঘাস ততো ফুল
যতো ফুল ততো ফুল ;
শেষ নেই, শেষ নেই।
কতো ফুল আছে হায়
কতো ফুল ফুটে ফুলে
কতো ফুল ঝ'রে যায় ;
শেষ নেই, শেষ নেই।

কতো ফুল তুলবে মানুষ ?
কতো কথা ভুলবে মানুষ ?
যতো কথা ততো ফুল।
কতো ফুল রাখবে সে মনে ?
অরণ্যে পর্বতে বনে
আকাশে-বাতাসে, ঝিলে-জলে
অতল সমুদ্রতলে
দলে-দলে ফুটে থাকে ফুল
লাল-নীল-শাদা-কালো
হলুদ-বেগুনি, আহা কতো রঙ।
শেষ নেই, শেষ নেই।

মানুষেরা তোলে তাকে
পাখিরাও কখনো-কখনো
ঠোঁটে ক'রে নিয়ে আসে ফুল।
বাতাস উড়িয়ে নেয়
মাটিরা কুড়িয়ে নেয়
কীটেরা জুড়িয়ে নেয় ক্ষুধা ;
তবু ফুল অগোচরে
জীবনের শূন্য পাত্রটিরে
পূর্ণ করে বিপুলা বসুধা

তৃষিতের মুখে ঢালে সুধা।
আমাদের কৃপা করে
ভালোবেসে অপরূপ সাজে
দেখা দেয় কদর্যের মাঝে
বারবার ;
বুঝি তার সীমাহীন করুণার
শেষ নেই, শেষ নেই।

হয়তো মানুষ তার কোনো নাম
এখনো রাখেনি
তাই সে নারীর মতো
অভিমানে লুকিয়ে থাকেনি
গাছে ঘাসে, আকাশে আঁধারে,
শিকড়ে ধুলায়।
যে পাখি ডাকেনি তাকে
নাম ধ'রে প্রহরে-প্রহরে
ঝড়ে ভাঙা সে পাখির
বিধ্বস্ত কুলায়
তবুও ফুটেছে ফুল।
খোঁপায় ওঠেনি বলে
নারীকে সে করেনি বিমুখ,
আত্মদানে যে পেয়েছে
অন্তহীন আনন্দের সুখ
সেই হলো ফুল।

এই বৈরী বিশ্বে তার
সীমাহীন করুণার
শেষ নেই, শেষ নেই।

বিদ্যাসাগর বন্দনা

নশ্বর মানব দেহ উত্তীর্ণ করেছো তুমি কাজে
তাই সে ছড়িয়ে গেছে অন্তহীন জীবনের মাঝে।
যেমন ছড়িয়ে আলো অন্ধকার রজনীর পথে
আসে উড়ে আসন্ন ভোরের সূর্য আকাশের রথে—
তেমনি এসেছো তুমি হাতে নিয়ে আলোর মশাল
ছিন্ন করে দিয়ে গেছো অন্ধমূঢ় বর্ণগর্বজাল।
ধর্মকে দিয়েছো নাড়া মানবিক কল্যাণের তরে
আপনি আচরি ধর্ম হয়েছো আপন ঘরে ঘরে।

বিধবার অশ্রু মুছি, মুক্তি চাহি দেশ—মাতৃকার
অচ্ছুতেরে দিয়ে গেছো জগতের সম অধিকার।
বুঝি তাই তোমাকে স্মরণ করে আজো বঙ্গভূমি,
আমার ঈশ্বর নেই, কিছুটা ঈশ্বর ছিলে তুমি।

ব্রুনো ইয়াসেনেসকির প্রতি

আজ 'গোত্রান্তর' শেষ হলো বৃটিশ কর্ণেল
বেইলীর কাছে লেখা একখানি খোলা চিঠি দিয়ে।
তার নীচে লেখা তোমার নামের উপর
আমি এঁকে দিলাম আমার কবি জীবনের
সবচেয়ে শিল্পিত চুম্বন।
আমার চুম্বন বেয়ে আমার রক্তের মধ্যে
মিশে গেলো তোমার অমর নাম, ব্রুনো ইয়াসেনস্কি।
কমরেড কামারাণ্কো, মরোজভ, সিনিৎসিন
আর সেই মার্কিন নির্মাণবিদ ক্লার্ক
আমার ঘরের জানালার পাশে শরতের মাতাল হাওয়ায়
গান গেয়ে উঠলো সবুজ কচি পাতাদের মতো।
সুপ্রভাত কমরেডগণ, সুপ্রভাত।

নাসিরউদ্দিনের কাটামুণ্ড প্রাণ পেলো আমার মস্তকে।
আর গালেৎসভের বীর গাথা মনে হলো যেন
মধ্য এশিয়ার মহাকাব্য।
অন্তর্ঘাতকের দল আর সেই চাবির গোছাটি
কোনোদিন খুঁজেও পাবেনা—ভাখশের জলে
স্লুইস গেটের সেই চাবিগুলি যেন গালেৎসভের আত্মা,
অন্তর্হিত। আমরা এখন চরম নিশ্চিন্তে
ভাখশের তীরে তীরে জল সেচে মরুভূমিতে ফলাবো
আমাদের প্রয়োজনমতো শস্য। অনেক কার্পাস।
উর্ত্তাবায়েভ তোমার কমিউনিস্ট নিষ্ঠাকে প্রণাম,
পলুজোভা তোমাকেও।

জানি এঁরা কেউ কল্পলোকজাত কোনো-উপন্যাস থেকে
উঠে আসা নিপুণ চরিত্র মাত্র নয়।
এরা সব বিপ্লবের বাস্তব সৈনিক।

তবু মনে হলো তাজিক তীব্রতা মাখা তোমার অন্তর
উৎসর্গিত সবার অধিক সত্যে।
বুনো ইয়াসেনর্সাক, তোমাকে প্রণাম।

আজ গোত্রান্তর শেষ হলো, ভাখশের জলে
সহাস্যে প্লাবিত হলো তাজিকের তীব্র মরুতৃষ্ণা।
শুরু হলো নতুন জীবন।
চিরজয়ী শ্রমিকের শ্রমে সামন্ত নিগড় ভেঙে
সদর্পে বেরিয়ে এলো মহারুশ, নব তাজিকিস্তান।
বুনো ইয়াসেনর্সাক, তুমি খুব ভাগ্যবান।

কমরেড মনি সিং—
তাঁর আশিতম জন্মদিনে

নদী যেরকম মহাসিন্ধুর অটল লক্ষ্যে
তুমিও তেমনি শ্রমজীবীদের তৃষিত বক্ষে
প্রবাহিত হও সোমেশ্বরির উদ্দাম গতি,
যদিওবা আশি পূর্ণ হয়েছে অতি সম্প্রতি।

বৃদ্ধ হয়েছে পুঁজিবাদ তুমি চির উত্থান,
বিপ্লবী তুমি, সাম্যবাদের গাহিয়াছো গান।
শোষক যেখানে করবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত
তুমিই এদেশে রচিয়াছো তার প্রথম ভিত্ত।

আশিটি বছর করে গেছো তুমি যার বন্দনা,
আজ লহো সেই কমিউনিস্ট অভিনন্দনা।

কলম্বাস

একটা পৃথিবী আছে যেখানে মৃত্যুর শেষ,
জীবনের রঙে রাঙা তার কালো যবনিকা—
মরতে মরতে শেষ হয়ে গেছে মৃত্যু,
পুড়তে পুড়তে ইঁট হয়ে গেছে মাটি।
মরতে মরতে আমরা এখন প্রায় এসে গেছি
সেই উত্তমাশা দ্বীপের ভিতরে,
আর এক নদী এগুলেই খুলে যাবে সমুদ্রের মুখ।
ঐতো সবুজ পাতায় ভরা ডাল ভেসে যাচ্ছে
বুঝি উজানে জীবন আছে, আছে বৃক্ষ, আছে মাটি।
হায়রে সবুজ পাতা
তোরা এভাবেই কলম্বাসদের ভেঙে পড়া মনের ভিতরে
বারবার স্বপ্ন জেলে দিস, তোদের মরণ নেই।
কলম্বাস জানে কী অর্থ বহন করে এই পাতাগুলি,
তাই তার ভেলা ছোটে সময়ের প্রতিকূল স্রোত কেটে কেটে
অনুকূল স্রোতের আশায় ইন্দ্রের সভার দিকে বাংলার বেহুলা যেমন।

আর এক নদী এগুলেই আমরা নতুন এক মহাদেশ পাবো,
সেখানে সবুজ পাতা ফুটে আছে জীবনের গাছে, মৃত্যুহীন।
কলম্বাস এই দেখো নূহের নৌকার সেই ক্লান্ত কবুতর
কী সুন্দর জল তরঙ্গের শীর্ষে বসেছে পাখা মেলে।
সমুদ্রের তলদেশ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে দ্রুত
এক নব ভৌগলিক শিখার আগুন,
তার সেকি লেলিহান মুখ।
মৃত্যুকে নিক্ষেপ করো সেই সর্বজয়া অগ্নির ভিতরে,
জীবনের হাত ধরে সে উঠবে বেঁচে। মৃত্যুকে বাঁচাও।
একটা পৃথিবী আছে যেখানে মৃত্যুর শেষ,
আমরা ওখানে যাবো।

প্রলেতারিয়েত

যতোক্ষণ তুমি কৃষকের পাশে আছো
যতোক্ষণ তুমি শ্রমিকের পাশে আছো
আমি আছি তোমার পাশেই।
যতোক্ষণ তুমি মানুষের প্রেমে শ্রদ্ধাশীল
যতোক্ষণ তুমি পাহাড়ী নদীর মতো খরস্রোতা
যতোক্ষণ তুমি পলিমৃত্তিকার মতো শস্যময়
ততোক্ষণ আমিও তোমার।

এই যে কৃষক বৃষ্টিজলে ভিজে করছে রচনা
সবুজ শস্যের এক শিল্পময় মাঠ
এই যে কৃষক-বধূ তার নিপুণ আঙুলে, ক্ষিপ্র দ্রুততায়
ভেজা পাট থেকে পৃথক করছে আঁশ
এই যে রাখাল শিশু খররৌদ্রে আলে বসে
সাজাচ্ছে তামাক—আর বারবার নিভে যাচ্ছে
তার খড়ে বোনা বেণীর আগুন,
তুমি সেই জীবন শিল্পের কথা লেখো,
তুমি সেই বৃষ্টিভেজা কৃষকের বেদনার কথা বলো
তুমি সেই রাখালের খড়ের বেণীতে
বিদ্রোহের অগ্নি জেবলে দাও,
আমি তোমার বিজয় গাথা করবো রচনা প্রতিদিন।

সেই শিশু শ্রমিকের কথা তুমি বলো
যে তার দেহের চেয়ে বেশি ওজনের মোট বয়ে নিয়ে যায়
ব্রাশ করে জুতো, চালায় হাঁপর
আর বর্ণমালাগুলো শেখার আগেই
যে শেখে ফিল্মের গান—বিড়ি টানে বেধরক।
তারপর একদিন ফুটো ফুসফুসে ঝরিয়ে রক্তের কণা
টানে যবনিকা জীবনের।
তুমি সেই শিশু শ্রমিকের বেদনার কথা বলো।

আমি তোমার কবিতাগুলো গাইবো নৃত্যের তালে
বুদ্ধিজীবীদের শুভ্র সমাবেশে।

তুমি উদ্বৃত্ত পুঁজির সেই গোপন রহস্যগুলো বলে দাও,
আমি তোমার পেছনে আছি।
যতোক্ষণ তুমি সোনালি ধানের মতো সত্য
যতোক্ষণ তুমি চায়ের পাতার মতো ঘ্রাণময়
যতোক্ষণ তুমি দৃঢ়পেশী শ্রমিকের মতো প্রতিবাদী
যতোক্ষণ তুমি মৃত্তিকার কাছে কৃষকের মতো নতমুখ,
ততোক্ষণ আমিও তোমার।
তুমি রুদ্র কাল-বোশেখীর মতো নেমে আসো
নগরীর ঐ পাপমগ্ন প্রাসাদগুলোর বুকে,
বজ্র হয়ে ভেঙে পড়ুক তোমার নতুন কাব্যের ছন্দ
শিরস্ত্রাণপরা শোষকের মাথার উপরে।
আমি তোমার বিজয়বার্তা করবো ঘোষণা জনপদে।

তুমি চূর্ণ করো অতি বুদ্ধিজীবীদের সেই ব্যূহ
কৃত্রিম দর্শন আর মেকী শিল্পের প্রলেপে
যে আছে আড়াল করে সত্য আর সুন্দরের মুখ।
আমি তোমার পেছনে আছি।
তুমি খুলে দাও সেই নব জীবনের দ্বার
পরশনে যার পৃথিবীর অধিকার
ফিরে পায় প্রলেতারিয়েত।

আমি এই বীরভোগ্যাবসুন্ধরা দেবো তোমাকেই।

লাল-মলাটের বইগুলি

এতো লাল আমি কোথাও দেখিনি।
ফুলে বা অস্তরাগে
যত লাল দেখি তার চেয়ে বেশী
এই লাল চোখে লাগে।

রক্তে এ লাল আগুন ছড়ায়
চেতনাকে করে সংহত,
জড় দর্শন খুলে দেয় জটা
ছন্দের জালও অংশত।

বর্ণশ্রেষ্ঠ এই লাল জানে
প্রলেতারিয়েত কি সে চায়,
ভেতরের কালো বর্ণমালারা
কি যে বিদ্রোহ জানে হায়!

এই লাল জানে সর্বহারার
কাস্তে হাতুড়ি চাঁদের ছন্দ,
বুর্জোয়া সব করে কলরব
তোলে শিল্পের বাতিল দ্বন্দ্ব।

বুঝি বাবুদের লাল রক্তের
পড়ে গেছে খুব টানাটানি,
শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ ভীষণ
সম্মুখে রণ আছেই জানি।

কমরেড লাল চেতনার রঙে
রাঙা রক্তিম বিশ্বের
পদধ্বনি বাজে আমার রক্তে,
হুংকার শুনি নিঃস্বের।

বর্ঝি মজদুরের কিষাণের হাতে
ঝলমল করা খড়্গের
দিন আসে ঐ মাভৈঃ মাভৈঃ
কাঁপে ঈশ্বর স্বর্গের।

ভালোবাসা পারে

যখন আকাশে ঝড়, দিগন্তে আঁধার এবং নদীতে নৌকো নেই
তখন তোমাকে ভালোবাসা পারে নদীর ওপারে নিয়ে যেতে।
ভালোবাসা সেই দুঃহের প্লাবনে হিজল কাঠের নৌকো।

যখন আক্রান্ত তুমি ডাকাত—খুনীর মুখোমুখি,
কিম্বা যখন তোমার প্রিয় জন্মভূমি শোষক শ্রেণীর হাতে বন্দী,
তার স্বাধীনতা পর্যুদস্ত—অথচ তোমার হাতে কোনো
মারণাস্ত্র নেই,
দিগন্তে আঁধার, সামনে সমুদ্র পেছনে পাহাড়
তখন স্মরণ করো ভালোবাসা—সেই মুগ্ধ প্রিয় শব্দের কুহক।
সে তোমাকে অস্ত্র দেবে, বল দেবে, বুদ্ধি দেবে, বীর্য দেবে
দেবে নব্য যুদ্ধের কৌশল।
তখন তোমাকে ভালোবাসা নদীর ওপারে নিয়ে যাবে।
ভালোবাসা শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষণের সেই বিশল্যকরণী।

রথের বাজার থেকে সাধ ক'রে কিনে আনা আম্রপালী নারী
হঠাৎ টেবিল থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে বলে হয়তো বিষণ্ণ তুমি।
বৃথা এই অশ্রুপাত, শান্ত হও, সম্বরণ করো ক্রোধ, দুঃখ করো না
যতোদূর পারো জড় করো প্রতিমার ভাঙা খণ্ড গুলো ফুলের সাজিতে।
তারপর একখণ্ড কালো বস্ত্রে ঢেকে দাও যেভাবে কফিন দিয়ে
ঢেকে রাখে শব।
মনে করো তুমি হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকর, তুমি যা বলবে তাই।
চন্দন চর্চিত হাত বুলাতে-বুলাতে মন্ত্রজ্ঞানে বলো 'ভালোবাসি'
দেখবে তখন ভালোবাসা কিভাবে তোমাকে নদীর ওপারে নিয়ে যায়।
ভালোবাসা ম্যাজিসীয়ানের সেই অলীক রুমাল।

ভালোবাসা পারে তার সজল কাজল চোখে তোমাকে কবিতা দিয়ে,
গান দিয়ে সমস্ত জীবন ভ'রে দিতে।
ভালোবাসা পারে নদীর কিনারে উবু হয়ে থাকা মেঘের চূড়ায়
শুভ্র বেদনার রক্ত-গোলাপ ফোটাতে।

এপ্রিলে বৈশাখ

তোমাকে দিইনি পর্বতমালা, সুনীল সাগর প্রিয়
কিম্বা সুদূর সাঁঝের শঙ্খচিল,
তোমাকে দিইনি স্বর্ণ কাতান হীরার অঙ্গুরীয়।
তোমাকে দিয়েছি চৈত্রের শাঁখা, এগারই এপ্রিল।
ষড়ঋতুদাহে একদিন এই দগ্ধ পৃথিবী যবে
ভেবেছিল তার চাতক মৃত্যু হবে তখনই বৃষ্টিধারা
নিয়ে এলে তুমি, সুপ্ত আকাঙ্খারা
ফিরে পেলো পাতা শুষ্ক ভগ্ন ডালে—
পুঁজিবাদী প্রেম বাঁধা হলো নব সাম্যবাদের জালে।

হায়রে চাতক পাখি
তোমার শাঁখায় বাঁধা ত্রিকালের রাখী,
তাইতো তোমারে দিইনি প্রেমের সহজ অন্ত্যমিল
তোমাকে দিয়েছি চৈত্রের চিতা, এগারই এপ্রিল।
তোমাকে দিইনি একবেনী হিয়া রানী
সুখ উল্লাস, স্বপ্নবাসর দিইনি তোমাকে জানি
তোমার যতনে লালিত পালিত ফুলে
দিয়েছি আমার দলিত কুসুম তুলে—তুমি সেই ফুলে
সাজিয়েছো খোঁপা, সাজিয়েছো ফুলদানী।

অসীম গগনে উড়ে চলে যারা রবি-শশী-তারা,
তাদের চলার পথে আমার চলার পথ
বেঁধে দিতে তুমি এলে। ঠিকানা কোথায় পেলে ?
পদতলে মাটি ফেটে চৌচির ঊর্ধ্বে আকাশ নীল
এরই মাঝে তুমি চৈত্রের মেঘ, এগারই এপ্রিল।
বাজেনি নাকাড়া, নহবৎ ধ্বনি সানাই অথবা শাঁখ
তবু এসে গেছে
নব পল্লবে,
নব উৎসবে, নব জীবনের নব অনুভবে এপ্রিলে বৈশাখ।

নিমন্ত্রণ

এসো একদিন অসীম আকাশ থেকে ঘুরে আসি,
দেখি ওখানে কেমন লাগে।
রবি শশী তারা অর্থাৎ ওখানে রয়েছে যারা
তারা আমাদের পৃথিবীতে আসবে না।
আমাদেরই যেতে হবে।

এসো একদিন ওদের নিকটে যাই
কাছে গিয়ে বলি 'আমরা এসেছি, আমরা মানুষ'
দেখি অসীম আকাশ কিভাব ব্যক্ত করে।
আমাদের দেখে খুশী হয় কিনা।

আমাদের আশা, আমাদের ভাষা
আমাদের যতো ঘৃণা ভালোবাসা
দেখি তাহাদেরো আছে কিনা।

ওরা আসবে না জানি, আমাদেরই যেতে হবে
তাহাদের সাথে আমাদের নয়
আমাদের সাথে তাদের প্রণয় হবে।
আমরাই যাবো।
আমাদের ঘৃণা আমাদের প্রেম
আমরা মিলাবো তাদের ভাষায়।

তাদের রয়েছে আলো তারা পাঠায়েছে পৃথিবীতে।
আমাদেরও আলো আছে, আছে গান,
আছে ছন্দ, আছে সুর, আছে সন্দেহ অতীত প্রাণ।
দেখি তার কোনো কণা অন্তহীন আকাশ বাহিয়া
পৌঁছিয়াছে কিনা তাদের ভুবনে।

তাদের নিষ্প্রাণ প্রাণে আমাদের প্রাণ
আমরা মিলাতে পারি যদি, তবেই সার্থক হবে গান

বিসর্জনের আগে দুর্গার প্রতি

কী থাকে তোমার যদি বাংলার মাটিজলে বোনা
সোনার প্রতিমা থেকে গত শরতের খড়গুলি
ক্রমান্বয়ে খুলে ফেলি, তবে ?
যদি ত্রিনয়ন থেকে তোমার দৃষ্টির জ্যোতি
ধুয়ে দিই তপ্ত অশ্রুজলে, কী থাকে তোমার, তবে ?
যদি শঙ্খপদ্মগদাচক্র কেড়ে নিয়ে শূন্য করে দিই দশবাহু
যদি অঙ্গ থেকে একে একে খুলে ফেলি সব অলংকার,
তবে আর কী থাকে তোমার ?
যদি পশ্চাতের শিল্প শয্যাপট, পায়ের তলার
বন্য সিংহ কেড়ে নিই, তবে কী থাকে তোমার দেবী ?

তোমার উড়ন্ত পদতল যদি না মৃত্তিকা পায় কোনো,
কোথায় দাঁড়াবে তুমি তবে ?   কুমার কার্তিক যদি শরক্ষেপে
শুধু ব্যর্থ হয়, যদি ব্যর্থ গনেশের লোকশ্রুত মেধার মাধুরী,
যদি শূন্য লক্ষীভাণ্ড সম্পদবিহীন ফাঁকা পড়ে থাকে,
যদি বীণাপাণি গান ভুলে যান
কী থাকে তোমার তবে, দুর্গা ?

যদি শিবশক্তি ঢাকা পড়ে মেঘের আড়ালে,
তোমার উদয়নাগ যদি শুধু সুধা ঢালে অমৃত দংশনে—
তাহলে অসুর ছাড়া আর কী থাকে তোমার তবে, দেবী ?

শেষ সূর্য

বছরের শেষ সূর্য দিবসের শেষ দৃষ্টি মেলে
পশ্চিমের অস্তাচলে এসে থমকে দাঁড়ালো স্থির,
নির্বাসনে যাবার সময় নিঃশব্দ চরণ ফেলে
যে ভাবে নিমাই এসে দীপ হাতে প্রিয়তমা স্ত্রীর
মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। অথবা সে কালরাতে
মৃত্যুহাতে দেসদিমোনার গৃহে যেমন ওথেলো।

'কে এলো ?' 'কে এলো ?' বলে উন্মীলিত পদ্মনেত্র মেলি
দেখিল দিনের সূর্য বসুন্ধরা ডুবিছে কেবলি
নিস্তব্ধ সমুদ্র মাঝে, অরণ্যে, পর্বতে, সাহারায়।
এইভাবে মানুষেরও একদিন সর্বস্ব হারায়।

সকরুণ অস্তরাগে যৌবনের রণরঙ্গিনীরা
দেখে দ্রুত অঙ্গ থেকে খসে পড়ে অন্ধকার চোলি।
আকাশ কাঁপিয়ে তবু নীড়ে ফেরে নববিহঙ্গীরা
মৃত্যুর জড়তা ভাঙে জীবনের মুক্ত পাখা মেলি।

আবার আকাশ জাগে, আবার জীবন জাগে জয়ে
গত সূর্য আসে ফের বছরের নবসূর্য হয়ে।

আমলাতন্ত্র

চুপ, কেউ কথা বলবেন না,
এখন ছারপোকাদের
ডিম ছাড়বার সময় হয়েছে।
তার জন্যে রাত দিন ধরে
তৈরী হচ্ছে সুরম্য প্রাসাদ,
ফ্রি ফার্নিশড কোয়ার্টার।
কেনা হচ্ছে সোফাসেট, এয়ারকুলার,
সেক্রেটারীয়েট টেবল, কার্পেট,
ফোন, গাড়ী আর
গ্যালন গ্যালন পেট্রোল।

কেউ ঈর্ষা করবেন না,
আমাদের রক্ত চোষা ছাড়া
ছারপোকাদের গত্যন্তর নেই।
ঘৃতে-মাংসে পুষ্ট হোক
তাদের স্বাস্থ্য, দিন আসুক
এই ছারপোকাদের দিয়ে
আমরা আমাদের
যৌথ খামারগুলি চাষ করাবো।

শুধু এই ক'টি শব্দ

প্রয়োজন আরো অনেক কিছুর জানি
আপাতত দিই শুধু এই ক'টি শব্দ।
এই নিয়ে হোক তোমাদের পথচলা
চলতে চলতে চেনা হোক পথখানি
জানা হোক যত পথের বিঘ্নগুলি।

তারপর যদি বিঘ্ন ডিঙাতে চাও
এসো মোর কাছে, আছে আরো আছে
তোমার হাতেই তুলে দেবো বলে এতো
লুকিয়ে রেখেছি ভালবাসা চাপা দিয়ে
বুকের ভিতরে নির্ঘুম নিস্তব্ধ
স্বপ্ন আমার, সাধনা আমার যতো।

আপাতত শুধু এই ডাক দিয়ে যাই
মুক্তির পথে সহজ কিছুই নাই
বড় বন্ধুর এবং জটিল অতি
পথে পথে শুধু ওত পেতে আছে ক্ষতি।

ছলনার জাল পেতে আছে নারী
শোষকের জাল আছে শত পাখা মেলে
তোমাকে জড়াতে টাকার বাঁধন দিয়ে
ওরা জানে তুমি পুঁজিবাদী পেয়ালায়
বুঁদ হতে পারো নেশার শরাব পিয়ে।

হয়তবা পথ ধর্ম আফিঙে মোড়া
হতে পারে জানি অতীত অভিজ্ঞতায়
হয়ত তখন হাতছানি দেবে সুখ
যখন তোমাকে জড়াবে ফুলের তোড়া—
তুমি কি বসবে শিখণ্ডী-ক্ষমতায় ?

মূঢ় ক্ষমতার মুখে লাথি মেরে তুমি
এগুবে তোমার অটল স্বপ্নলক্ষ্যে
সর্বহারার রক্ত তোমার বক্ষে
প্রবাহিত হবে প্রবল নদীর মতো
তোমাকে পূজিবে জননী জন্মভূমি।

প্রয়োজন আরো অনেক কিছুর জানি,
আপাতত দিই শুধু এই কটি শব্দ।

শ্রমিক ও ঈশ্বর

"দল বেঁধে কি খোঁজো তোমরা এতো মন্দিরে গীর্জায় ?
কিছু হারিয়েছো বুঝি ?" ভক্তবৃন্দ গর্জে ওঠে প্রায় :
"হায় লোকটা পাগল ? শয়তান ? নাকি রাতকানা ?"
'আমরা ঈশ্বর খুঁজি, তুমি বুঝি কিছুই জানো না ?

'জানি, তবে জীবনে কখনও ঈশ্বর দেখিনি কিনা
তাই ঠিক বুঝতে পারি না তাঁর মূল্য কতোখানি,
দিনের কাজের শেষে একটি আধুলি পাই হাতে
ভালবেসে পুজো করি, তাকেই ঈশ্বর ভাবি রাতে।

পরস্পর কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসে তাঁরা :
'লোকটা নিরেট মূর্খ, একে ঠিক পাপী বলা যায়।'
বুঝি ভক্তবৃন্দ ক্ষেপে গেছে খুব। এটা স্বাভাবিক,
এই ভেবে ওদের সান্ত্বনা দিই "তা ঠিক, তা ঠিক"
'পাপী কিনা একথা জানি না তবে মূর্খ যে তা মানি,
তা না হলে দিনের মজুরি কেউ এভাবে হারায় ?

বেদনায় অশ্রু আসে চোখে, দেখে হাসে ভক্তবৃন্দ :
'একি ? একে নিয়ে ভারী জ্বালা হলো দেখি আমাদের
একটি আধুলি বৈতো নয়, তার জন্য এতো মায়া ?
যাই বলো ভ ই লোকটা বেহায়া ছাড়া কিছু নয়।'
'আরে ঈশ্বরের অসীম করুণা সবাই কি পায় ?'

'আর যেন না হারায়' বলে ক্রুদ্ধ অন্য একজন
নিজের পকেট থেকে একটি আধুলি দ্যায় ছুঁড়ে ;
আর সেই আধুলিটা অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত হয়ে
বৃত্তাকারে ঘুরে থামে শ্রমিক প য়ের কাছে এসে।

তখন আঁধারে ভেসে শেষ প্রশ্ন আসে 'কে সে ? কে সে ?'

শত্রু

আর একটু হলেই ফুল ফুটতো বনে
কুঁড়ি ধরেছিলো গাছের ডগায়।
সবুজ পাতার নিচে কালো শিরা
হয়েছিলো উজ্জ্বল—
যেন পুষ্ট পোয়াতির বাহু
নবীন লাবণ্যে ঢলঢল।
ফুলসুখে মাথা তুলেছিলো পাতাগুলো সব
নবসূর্যের দিকে
আর একটু হলেই ঘোমটা খুলতো বধূ।
আর একটু হলেই রাত্রি যেতো কেটে।
আর একটু হলেই প্রজাপতির সনে
দেখা মিলতো ফুলের।
অনুরাগের পরাগ ছুঁবে বলে
পাখায় রেণু মেখে
তৈরি ছিলো সারাবনের পাখি,
মনের মতো রঙ পরাবে বলে
অপেক্ষাতে আকাশ ছিলো ফুলের মুখোমুখি।

কিন্তু ফুল ফুটলো না তো হায়,
খুনীরা দিলো গাছের গোড়া কেটে।

খেয়ার মাঝি দলে নেয় না

একটু বড় হয়েছি কি হইনি চারদিক থেকে হৈ চৈ করে
উঠলো মানুষ,
যেন আমি একটি প্রকাণ্ড মই কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি
পাকা ধানের খোঁজে।
অথচ কারো পিতৃপুরুষের ভিটেয় ঘুঘু চরানো আমার কর্ম নয়—
আমি বরং উল্টো কাজের মানুষ।
আমি ছুটছি নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে খরস্রোতে সাঁতার কাটতে।
বিকেল বেলায় ব্রহ্মপুত্রের তীর ঘেঁষে দৌড়াচ্ছি সূর্যাস্তের
মুখোমুখি—
আমার স্বাস্থ্যটা আরও ভালো হওয়া দরকার। আলস্য থেকে
মুক্তি নিয়ে,
সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন আমার শয্যা ছাড়ার সময়।

একটু বড় হয়েছি কি হইনি চারদিক থেকে এত গেল গেল রব
উঠছে কেন ?
শুধুকি মানুষ ? আকাশ আমাকে দেখিয়ে বলছে
"ঐ যে, ঐ যে ঐ ছেলেটা"
নদী বলছে "এখানে কেন ? এখন তুমি বড় হয়েছো, সমুদ্রে যাও।"
বাতাস বলছে "ছেলে কোথায় ? এযে দেখছি বড় মানুষ,
লোকটা বলো।"
ময়মনসিংহ তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে
"এই শহরে কখন এলে ?
তুমি না সেই ঢাকায় ছিলে ?"
খেয়ার মাঝি দলে নেয় না।
কুলীরা সব প্রশ্ন করে "তুমি এমন ফর্সা কেন, আমরা চাই
ময়লা মানুষ।"
আমি এখন ময়লা মানুষ কোথায় পাবো ?

ঈশ্বরের জন্ম

যা কিছু কম্পিত করে মানব হৃদয়, জন্ম থেকে
মানুষ পেয়েছে সেই সীমাহীন আকাশের ভয়।
যে আকাশখানি তার মাথার উপরে নুয়ে থাকে
প্রতিদিন, রবিশশী তারায় সাজানো সীমাহীন
সে আকাশে বিচলিত বিপন্ন বিস্ময় জন্ম নেয়
মানুষের মনে। শেষ হয় মাটি, শেষ হয় জল।
অতল জলের সত্য জেনে যায় সরল মানুষ।
পাহাড় ডিঙিয়ে পঙ্গু পৃথিবীকে আনে ছোট করে,
মাটি খুঁড়ে তুলে সোনা, জল ছেনে আলোর বিজুলি,
সূর্য থেকে তাপ আনা যদিও হয়েছে শুরু—তবু
দূর অসীম আকাশগুলি রয়ে গেছে অগোচরে।
অসীম কেননা তার সীমা খুঁজে পায়নি পৃথিবী
যেমন পেয়েছে ক্রমে পাহাড় সমুদ্র মাটি, প্রাণ
বস্তুধর্মে প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ধারাতেই।
এরাও অসীম ছিল একদিন, আজ ততো নেই।

আকাশের ওপারে আকাশ হয়তবা আছে, তাই
এতো আলো। হয়তবা নেই, তাই এতো অন্ধকার।
জানি শেষ সত্য আজো জ্ঞাত নয়—তবু মনে হয়
'আছে' এই প্রিয় সত্যে সুপ্রাচীন মানব হৃদয়
বেশী আস্থাবান। যেখানে অসীম শূন্য, মানুষের
প্রজ্ঞা নিরুত্তর, সেখানে সে জন্ম দিয়েছে ঈশ্বর।

তাই সে উত্তরে নেই, মানুষের প্রশ্নে ধাবমান।

মৌমাছির মুক্তিযুদ্ধ

মাকড়সার জাল পাতা ছিল জানালার পাশে।
যদি কোনো ক্ষুদ্র কীট বা কোনো পতঙ্গ উড়ে আসে
নির্ঘাৎ সে বন্দী হবে তাতে।
তাই হলো। একদিন দলছুট একটি দুরন্ত মৌমাছি
আটকা পড়লো সেই জালে। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ।
যত সে মুক্তি চায় ততো সে জড়িয়ে যায় জালে।
পা নাড়লে পা, পাখা নাড়লে পাখা
মাথা নাড়লে ছোট্ট মাথাখানি।

আমি সেই জালবন্দী মৌমাছির মুক্তিযুদ্ধ দেখি।
দূরে বসে অপেক্ষায় গোঁফ নাড়ে কালো মাকড়সা।
জাল বুনে চলে মৌমাছিটিও।
তার কোনো প্রতিকৃতি নেই,—যাকে বলে মায়াজাল
আমি সেই জালে বাঁধা পড়ি।
মৌমাছির মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে জড়াই।
শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়।
আমার আঙুলগুলি ক্ষেপণাস্ত্র হয়ে দ্রুত ছুটে যায়
তার পরিত্রাণে। ছিঁড়ে ফেলে জালের বন্ধন
আকাশে উড়িয়ে দিই আকাশের মুক্ত মৌমাছি।

মুক্তির আনন্দে মাতোয়ারা সেই ক্ষুদ্র প্রাণীটি তখন
হয়ত মিত্রের কথা স্মরণে রাখে না আর,
হয়ত আমার ধাত্রী অঙ্গুলিকে অঙ্গুরীয় হয়ে
তখনও জালের সেই সূক্ষ্মতন্তুগুলি গ্রাস করে রাখে,
ব্যর্থ মাকড়ের শিকার তাড়ানো অভিশাপে
হয়ত তখনও আমি বিদ্ধ হই তীব্র ভ্রূকুটিতে।

তবু, অপার আনন্দে মন ভরে থাকে অনুখন,
যখন আকাশে দেখি একটি স্বাধীন পাখি ওড়ে।

জগদ্দল

থামলে কেন ? আঘাত করো,
আঘাত করো, আঘাত করো।

ভাঙলো না তো ? তাই বলে কি
হবে তোমার আঘাত মেকী ?

হয়ত তুমি ক্লান্ত হবে,
তাই বলে কি শান্ত হবে ?
নিত্য নব অভিজ্ঞতায়
করবে আরো শক্তি জড়ো।

থামলে কেন ?আঘাত করো,
আঘাত করো, আঘাত করো।

যখন তুমি বিদায় নেবে
আসবে নব তরুণ দল,
ভাঙবে তারা পথের কারা
মুক্ত হবে জগদ্দল।

গ্রাম থেকে ট্রেন আসে

গ্রাম থেকে ট্রেন আসে
তার ছাদে জনতার কবি।
আকাশের নীল মেঘ ছুঁয়ে যায়
কবির উড়ন্ত কালো চুল।
এমন একটি ছবি
তোমাকে পাঠাবো বলে
রং তুলি নিয়ে
তরুণ শিল্পীর মতো
'একতা'র* ছাদে বসি
আকাশে হেলান দিয়ে।

পাশে ভীত ত্রস্ত যাত্রীদল
ল্যান্ডিকোট গায়ে
স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল কারো,
কেহ নগ্নপায়ে।
কেহ বসা, কেহ অর্ধশোয়া
আলাপে তাড়ায় শীত,
চোখে পোড়া ডিজেলের ধোঁয়া
এসে লাগে—
ফেরিওলা ভিখিরির গানে
সুরের পৃথিবী যেন জাগে।

গড়ের ভিতর দিয়ে
পথের পাথর গুনে গুনে
আমাদের ট্রেন ছোটে
নগরীর পানে।

এমন সহজলভ্য জীবনের ছবি
তোমাকে পাঠাবো বলে প্রিয়ে
মৃত্যুকে মুঠোয় পুরে নিয়ে

আঁকি মুগ্ধ মোনালিসা স্বপ্ন
        ক্যানভাসে,
যদিও বা জানি যে তা দূরে
তবু বলি গভীর বিশ্বাসে
ঐ তো আমাদের ঢাকা আসে।

গ্রাম থেকে ট্রেন আসে
তার ছাদে আগামীর কবি।

একতা : রেলপথে ঢাকা-দিনাজপুর সংযোগকারী শ্রেণীহীন যাত্রীবাহী এক্সপ্রেস ট্রেন।

শম্ভুগঞ্জ জুট মিল

[আ ন ম রফিক প্রিয়বরেষু]

ওপারে শহর নদীর এপারে মিল
চটবুনে চলে সারাদিনমান ধরে,
চিমনীর ধোঁয়া খুঁজে আসমান নীল
একদল আসে, একদল ফেরে ঘরে।

মিলের পাশেই এক পা এগুলে খেয়া
নদী পারাপার চলে ফেরী নৌকায়,
ডোবায় যখন ফুটে বর্ষার কেয়া
ক্লান্ত শ্রমিক দলবেঁধে গান গায়।

কদম গন্ধে মৌ মৌ করা পথ
চলে গেছে দূর নীল পাহাড়ের ডাকে,
ওখানে স্বাধীন মেঘেরা উড়ায় রথ
মিলের শ্রমিক কাছে পেতে চায় তাকে।

নদীর এপার ভরে ওঠে কাশ ফুলে
মনে হয় যেন মথিত পাটের আঁশ
মেখেছে মিলের বালকেরা কালো চুলে,
ফুসফুস চায় একটু শীতল শ্বাস।

নদীর ওপারে বড় বেশী মুখোমুখি
হাতছানি দেয় যক্ষা হাসপাতাল,
যদিও সে আজ যৌবন বলে সুখী
ওখানে শ্রমিক যাবেই আগামীকাল।

তাই বলি ভাই আমার কথাটি শোনো
আজকেই তুমি চট বুনবার ফাঁকে
আগামীকালের নতুন স্বপ্ন বোনো,
তোমার দুয়ারে নব বিপ্লব হাঁকে।

ইতিহাস জানে অযোগ্য তুমি নও
উত্থিত হও সংঘবদ্ধ চিতে,
তুমি শোষকের মৃত্যু পতাকা বও
তোমাকে দেখেছি বিশ্বের ভার নিতে।

একুশের কবিতা

কুঁড়ি যেরকম শিমুলের ডালে
লাল যেরকম কিশোরীর গালে
জল যেরকম গাছের গোড়ায়
তেমনি আমার এই কবিতাটি
একুশের তাজা ফুলের তোড়ায়।

মাঝি যেরকম পাল তোলা নায়ে
পথ যেরকম পথিকের পায়ে
পাখি যেরকম অসীম আকাশে
তেমনি আমার এই কবিতাটি
একুশের রং তুলিতে আঁকা সে।

নদী যেরকম সাগর সলিলে
চোখ যেরকম আকাশের নীলে
নারী যেরকম পুরুষেতে মিলে তৃপ্ত
তেমনি আমার এই কবিতাটি
একুশেতে মিলে সংগ্রামে উদ্দীপ্ত।

যুদ্ধে যেমন দেশ দুর্জয় ঘাঁটি
সোনা যেরকম অগ্নিতে পুড়ে খাঁটি
মাটি যেরকম চিমনীতে পুড়ে ইঁট
তেমনি আমার এই কবিতাটি
একুশের নামে প্রতিবাদে কংক্রিট।

আলোর সন্ধানে

বীজের ভিতরে বসে মাথাকুটে অংকুর
মুক্তি চায় মহীরুহ—আলোর সন্ধানে।
মাতৃগর্ভে বন্দী শিশু জটিল অন্ত্রের বন্ধ
ছিঁড়ে ফেলে পদাঘাতে—আলোর সন্ধানে।

ফুল বলে আলো চাই
পাখি বলে আলো চাই
মাটির প্রদীপ বলে আলো চাই
ঘাসের শিশির বলে আলো চাই
রাতের জোনাক বলে আলো চাই
আরো আলো, আরো আলো চাই।

গহীন অরণ্যে বৃক্ষ মাথা তুলে দীর্ঘ হয়—
আলোর সন্ধানে।
মানুষ বৃক্ষের মতো এতো দীর্ঘ নয়।
আঁধারে আবৃত বিশ্বে
পাথরে পাথর ঘষে, হৃদয়ে—হৃদয়
সে তার আপন হাতে
জ্বালে নিত্য অন্তরের আলো—
আছে যার অনির্বাণ শিখা।

বিদ্রোহের জন্য এই বৃষ্টি কোনো অন্তরায় নয়

নারী নিতম্বে গর্বিত ধরণীতে
হয়ত নেমেছে জল পৃথিবী পাগল করে দিতে।
হয়ত পথের পাশের ডোবায়
ফুটেছে বিজনে কেয়া,
ঝড়ো রাত্রিতে হয়ত নদীর বন্ধ হয়েছে খেয়া।
তবু জানি বিদ্রোহের জন্য এই বৃষ্টি
কোনো অন্তরায় নয়।

হয়ত আকাশ ভরে গেছে ঘন মেঘে
হয়ত প তারা হয়েছে মাতাল
উদাসীন হাওয়া লেগে।
হয়ত গগনে দেয়া গরজিছে,
হয়ত গোপন হৃদয় সঁপিছে কেউ—
তবু জানি বিদ্রোহের জন্য এই বৃষ্টি
কোনো অন্তরায় নয়।

বেতসী লতায় ঘেরা বনছায়
সিক্তবসনা বধূরা হারায়ে পথ
যখন পরেছে নাকে বৃষ্টির নথ,
হয়ত আকাশ কেঁপেছে পৃথিবীময়—
তবু জানি বিদ্রোহের জন্য এই বৃষ্টি
কোনো অন্তরায় নয়।

হয়ত আকাশ হয়েছে বিজুলি লাল,
হয়ত প্রেমের আবীর মেখেছে গাল।
হয়ত সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত ইঙ্গিতে গেছে থামিয়া...
তবু জানি বিদ্রোহের জন্য এই বৃষ্টি
কোনো অন্তরায় নয়।

একটি ভিক্ষা-বিরোধী কবিতা

তুমি নও ফুল, টকটকে জবা
অথবা বকুল—
অঙ্গে তোমার সৌরভ নেই জানি।
শীর্ণ শরীর, শুকনো মুখখানি নিয়ে
তুমি এসে যেই দাঁড়াও দুয়ারে
রাজ্যভ্রষ্ট রানী,
তোমাকে সাজাই সকল বাসনা দিয়ে।
বিরতিবিহীন বর্গীর তাণ্ডবে
ভিক্ষাপাত্র হাতে ;
জন্ম তোমার হাহাকার ভরা রাতে।

হায় ভিখারিণী মেয়ে
তোমার হৃদয়ে ফুটে না প্রেমের ফুল,
তুমি শুধু চাও ক্ষুধা তাড়াবার
এক মুঠো তণ্ডুল।
তোমার জগৎ হয়নি সাজানো
মানুষের গড়া সহজ সুখের পণ্যে,
আমি লিখি তাই একটি কবিতা
শুধুই তোমার জন্যে।
তোমাকে পারি না বলে
কবিতাকে দিই তোমার প্রাপ্য
অপারগ আঁখি জলে।

শিকারীর কাছে হরিণ মিনতি
সহজে পশে না জানি—
হরিণ শিকারী হেন সমাজের
তোমরা হরিণ।
তোমাদের দিন আনব বলেই
আমি প্রতিদিন আমার কাব্যে,
ভালোবাসাহীন পথের দেয়ালে
লিখি বিপ্লব বাণী।

মানুষের হৃদয়ে ফুটেছি

গতকাল ছিলো কালো লালে মেশা
একটি অদ্ভুদ টুনটুনি।
লাফাচ্ছিল ডাল থেকে ডালে
পাতার আড়ালে,
ফুল থেকে ফুলে।

তার সোনামুখী ঠোঁট যেন
কলমের ডগায় বসানো একরত্তিহীরে।
প্রতিটি আঁচড়ে কেটে ভাগ করছিল
ফুল থেকে মধু,
মধু থেকে ফুল—
আমার সমস্ত কলতল ভেসে যাচ্ছিল
রক্তকরবীর মধুস্রোতে।
আমি কি করব ?

আজ সকাল থেকেই এই রক্ত করবীর ডালে
ফুলের আগুন জ্বলা হাত—
ফুল তুলছেন এক বৃদ্ধা পূজারিণী।
তার হাতে রক্তকরবীর নক্সাকাটা সাজি।

মধু নয়,
শূন্য বৃন্তে শুভ্রকষধারা।
কলতলে রক্তকরবীর হু হু কান্না,
আমি কি করব ?
এই রক্তকরবীর ডালে আমিতো ফুটিনি।
আমি পৃথিবীর দুঃখী ফুল, মানুষের
হৃদয়ে ফুটেছি।

ভাত না-পাওয়া মানুষগুলি

তোমরা না হয় সুখে আছো
পাচ্ছো খেতে বাংলাদেশের টাটকা ঘি।
কিন্তু যাদের দিনের শেষে ভাত জোটে না,
তাদের কি ?

দোষ হবে কি, কেউ যদি এই
অবস্থাটার শেষ চায় ?
ভাত না-পাওয়া মানুষগুলি
আবার যদি একটি নতুন দেশ চায় ?

এক রিক্সাচালকের গল্প

ক্রিং ক্রিং মধুছন্দে তুমি কি গান বাজালে এই দুপুর বেলায়।
এই নাও বিশটি পয়সা, তুমি পান খেয়ে নিয়ো ফেরার সময়।
বদরকে বলো সে যেন তোমার পানে একটু সুরভি ঢেলে দেয়,
এই খর-রৌদ্রে জর্দা না খাওয়া ভালো।
তুমিতো আমার মতো ফুরফুরে ফ্যানের হাওয়ার নীচে বসে
অতুল বাবুর গান শুনবে না আর।
তুমি যাবে ইষ্টিশানে যাত্রী নিয়ে, যাবে নৌমহল, কাঁচিঝুলি।
হয়ত নাছোড়বান্দা একটি মাতাল এসে চেপে বসবে তোমার গাড়িতে
তাকে নিয়ে চলো নদীঘাট।
তার খুব হাওয়া নাকি চাই।

এর মধ্যে আছে ট্রাক, আছে সরকারী সীলমারা জীপের গর্জন
আছে গাঁও গেরামের সরল মানুষ, তার এলোমেলো পথ চলা,
আছে লেভেল ক্রসিং, আছে ঠেলাগাড়ী, চেনখুলে যাওয়া বিড়ম্বনা,
অসহিষ্ণু যাত্রীর ধমক। তোমাকে থাকতে হবে সতর্ক ভীষণ।
ক্রিং ক্রিং শব্দে ছন্দ তুলে তুমি ছুটবে দুপুর বেলা জুড়ে
খোয়া-ওঠা সরু পথ ধরে। তোমার পিঠে ঘাম, পায়ে ফোস্কা
আহা হঠাৎ একটু বৃষ্টি যদি নামে।
লুঙ্গি থেকে ভেসে আসা পেচ্ছাপের ঘ্রাণে কুঞ্চিতনাসিকা
যাত্রী দেখে দেখে
হঠাৎ পড়বে মনে তোমার ঐ কালো কুচকুচে ছেলেটির কথা।
কী দুরন্ত যে হয়েছে ছেলেটি। তার সে-কী স্বপ্নটানা চোখ।
তোমার অপেক্ষা শেষে সে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে মার কোলে।
আর পাশের বাড়ীতে কাঁথা বুনতে বুনতে তোমার স্ত্রী
ভাবছে তোমার কথা মনে
তুমি কখন ফিরবে মিঞা ? সেই যে সকালবেলা
গত রাত্রির বাসিভাত খেয়ে তুমি গেছো—আর কি পড়েছে
কিছু পেটে ?

একটি ‘গোলাপ বিড়ি’ খেয়েছিলে ঘণ্টা দুই আগে

তারপর পাওনি সময় এতটুকু। শুধু যাত্রী, যাত্রী আর যাত্রী।
‘এই শালা হারামির বাচ্চা’
বুঝি খুব ক্লান্ত হয়ে পথপ্রান্তে এসে একটু দাঁড়িয়েছিলে তুমি,
তাই, তোমাকে তাড়িয়ে দিলো ট্রাফিক পুলিশ।

তুমি ফিরে যাচ্ছো ঘরে।
বিধ্বস্ত, বিমর্ষ, ক্লান্ত—তবু ক্রিং ক্রিং মধুছন্দে তুমি
ভীষণ মাতাল করে যাচ্ছো পথচারীদের। হাতের মুঠোতে তুমি
টুঁটি টিপে ধরে আছো বিষাক্ত গোক্ষুর দুটি অবিচল।
তোমার পিঠে ঘাম, পায়ে ফোস্কা, চোখে জল।

মাতৃভূমির সমস্ত মাটিকে

আমার তখন হামাগুড়ি দিয়ে সারা গায়ে মাটি মেখে
ঘুরে বেড়ানোর বয়স।
কিম্বা বলা যায় তারও কিছু আগে, যে সময়টাকে
আমরা আমাদের জীবন থেকে পৃথক করে ভাবি,
অর্থাৎ আমি ছিলাম যখন আমার মায়ের গর্ভে
খুব নিরাপদ এবং নিঃসঙ্গ ;
তখন প্রতিদিন সন্ধ্যে বেলায় মাটির তলার
ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের গান শুনবার জন্য
অধীর আগ্রহে কান পেতে থাকতাম আমি।
ঝিঁ ঝিঁ পোকারা মাটি কাঁপিয়ে দলবেঁধে সমস্বরে
গান গেয়ে উঠতো—আর আমি যা শুনতে চাই
তাই শুনতে পাবার ভয়ে যখন জড়িয়ে ধরতাম আমার মাকে
তখন থেকেই আমার মায়ের পায়ের তলার
এই মাটিকে আমি জানি।

আগুনে পোড়া চিকন মাটি ছিল আমার মায়ের খুব প্রিয়,
আমি ভিতর থেকে কতো আনন্দেই না গ্রহণ করতাম তাকে।
আমার মায়ের নিকানো উঠানে আমি বারবার ছুটে যেতাম
আলপনা আঁকা পদ্ম তুলে আনতে।
গায়ে কাদা মাখিয়ে কতোবার যে নষ্ট করেছি
আমার নতুন কেনা মূল্যবান জামা—কতোবার যে
মায়ের সতর্ক চোখ ফাঁকি দিয়ে বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়েছি
পিতৃপুরুষের এই কোমল কঠিন মাটির উপরে—
আমার কিছু হয়নি, শুধু আঘাতে আঘাতে বেড়েছে আমার
আঘাত সইবার শক্তি।
এই মাটির কল্পিত পীযূষধারায় বারবার আমি
আমার স্তন্যপানের তৃষ্ণা মিটিয়েছি।

আজ সে সব কথা ভেবে যখন পায়ের তলার
এই মাতৃরূপা মাটির দিকে তাকাই

বুকের ভিতর থেকে ফেলে আসা শৈশবের হুহু করা কান্না
উঠে আসে—আমি কাঁদি।

মনে হয় এক বৃদ্ধ কুমোর আমার শরীরে বসে
ছেনে চলেছেন মহাকালের মণ্ড। অপত্য স্নেহের জোয়ারে
ভেসে যেতে যেতে আমি ফিরে তাকাই এই মাটির দিকে।

কতো মুশলধারার বৃষ্টিতেই না ভিজেছে তার অন্তর,
কতো চৈত্রের দাবদাহেই না ফেটে চৌচির হয়েছে তার দেহ,
কতো যুদ্ধ, দাঙ্গা, মারী, মড়কের আঘাতই না সে সয়েছে
মুখ বুজে,
কতো শস্যবঞ্চনার অসহ্য প্রহরকেই না সে প্রত্যক্ষ করেছে
তার অনিচ্ছুক চোখে।

ইচ্ছে হয় আমার প্রিয় মাতৃভূমির সমস্ত মাটিকে
সমস্ত জীবন আমি আমার দু'হাতের অঞ্জলিতে ধ'রে রাখি,
মা যেরকম জনারণ্যে আগলে রাখেন তার দুরন্ত শিশুকে।

চাষাভুষার কাব্য

[কবি জসীম উদ্‌দীন-এ'র শ্রীচরণে]

চাষাভুষার জন্য তুমি লিখতে আমায় কহ যে
চাষাভুষার কাব্য লেখা যায় কি এতো সহজে ?

সবাই যারে পথের ধারে গেছে দু'পায় দলে
তুমি কি চাও নাম কুড়াতে তাঁদের কথা বলে ?
তাঁদের সেই ঘাম জড়ানো নাম কুড়াতে হলে
পুড়তে হবে মাঠের রোদে, ভিজতে হবে জলে।

জানতে হবে তাঁদের কথা তাঁদের ব্যথাগুলি,
যেমন জানে ফুলের ব্যথা বনের বুলবুলি।
বিদ্যা থেকে বঞ্চিত যে শ্রম থেকে সে নয়
কাজের মাঝে খুঁজতে হবে তাঁদের পরিচয়।
শিখতে হবে তাঁদের কথা তাঁদের হাসিগান
গাইতে হবে তাঁদের সাথে নাইতে হবে প্রাণ।

স্বাস্থ্যহীন, স্বপ্নহীন, বিদ্যাহীন ঘরে
যাদের মোরা রেখেছিলাম অপাঙ্‌ক্তেয় করে,
তাঁদের তরে আকাশভরে জ্বালতে হবে আলো
ঢালতে হবে জীবন সুধা বাসতে হবে ভালো।

স্বাস্থ্য দিয়ে স্বপ্ন দিয়ে বিদ্যা দিয়ে তাঁরে—
গাঁথতে হবে একটি মালা একটি পরিবারে।
নইলে সবই ব্যর্থ হবে, শিল্প হবে ছল—
অর্থহীন বাষ্প হবে শুধু চোখের জল।

যাদের হাতে অনেক জমি কালোটাকার ভূত
তাদের সাথে লড়াই করে কতো চাষার পুত,
কালো জামন লাল করেছে বুকের তাজা খুনে
সীমারেরও অশ্রু ঝরে সেই কাহিনী শুনে।

কতো উপেন কাঙাল হয়ে হারিয়ে গেছে তার
চোখের জলে করুণ গাঁথা কেউ লেখে না আর।

ধানের হাসি মাঠের হাসি চাষীর হাসি নয়
চাষীর বুকে চিরকালের দুঃখ নদী বয়।
শীর্ণদেহ, জীর্ণবাস, দীর্ণগেহখানি
আজো তাঁদের জীবন জুড়ে সত্য বলে জানি।

সভ্যতাকে বন্দী রেখে কতিপয়ের হাতে
চাষাভূষার কাব্য লিখে লাভ কি হবে তাতে?
আঘাত করে ভাঙতে হবে ছেঁদো কথার ছল
চিনতে হবে কারা শোষক, কারা জগদ্দল।

জীবন থেকে নিঃস্ব হাতে ফিরে যাবার আগে
যাদের বুকে মাঠের ছবি কাবা'র মতো জাগে,
চাষাভূষার কাব্যে তুমি লিখো তাঁদের গান
দিয়ো তাঁদের রোজহাসরে বীরের সম্মান।

মাটি যেথায় লেখার খাতা, কলম যেথা ফলা,
রক্ত যেথা কবির কালি—সেই শ্রেষ্ঠ কলা।

আমার কবিতা

[বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী-কে]

আমার কবিতা রোগীর পথ্য
মাগুর মাছের জিরাবাটা ঝোল,
আমার কবিতা মাতাল বাতাসে
গন্ধ ছড়ানো আম্রের বোল।

আমার কবিতা সর্ষে মাখানো
ঝরঝরে ভাতে সজনের ডাঁটা—
আমার কবিতা মজুরের ঘামে
রাধিকার তনু জড়ানোর আঁঠা।

আমার কবিতা শিশুর শিশ্ন
উলঙ্গ সদা এবং দাঁড়ানো ;
নিপীড়িত যত ব্রাত্যজনের
উদ্দেশে দুই বাহুকে বাড়ানো।

আমার কবিতা পুং-মৌমাছি
মধু আহরণে মত্ত সদাই,
রোদ্দুরে পুড়ে পাথর কাটিয়া
যেনবা মূর্তি গড়িছে রদাঁ-ই।

আমার কবিতা রক্তের নদী
সাম্য-সাধক অসির ঝলক,
শোষকের ত্রাস, এবং মায়ের
অশ্রুসজল চোখের পলক।

আমার কবিতা চাষাভুষাদের
স্বার্থে শানানো নিপুণ অস্ত্র,
আমার কবিতা আকাশের তারা
বুটি কাজ করা তাঁতের বস্ত্র।

আমার কবিতা তাঁদের জন্য
যাঁদের গায়ের বিদ্রোহী ঘাম,
এই ধরণীর ধূসর ধূলায়
লেখে প্রত্যহ সাম্যের নাম।

আমার কবিতা পাতাবাহারের
অনেক রঙের মাঝের ঐক্য,
আমার কবিতা সারা বিশ্বের
নিঃস্বজনের নিবিড় সখ্য।

আমার কবিতা বাক্যেশ্বরী
অনিবার্য সে বাঁচার মন্ত্র,
আমার কবিতা সর্বহারার
মুক্তি-সনদ, সমাজতন্ত্র।

জটায়ু

প্রাসাদে এতো যে জ্বালাই প্রদীপগুলি
পথে পথে আজ এতো যে তোরণ তুলি
এতো যে আসর উন্মাদ করি নৃত্যে
ঘোচে না আঁধার, জাগে না পুলক চিত্তে।

চকচক করা নকল সোনার মতো
মনে হয় যেন ছলনার জালে বোনা,
পতাকা শোভিত আকাশ চতুর্দিকে।
মনে হয় যেন রাত্রির কুয়াশায়
ষড়যন্ত্রের সবুজ শিশিরে ভিজে
পতাকার লাল সূর্য হয়েছে ফিকে।

বিবেক যেখানে নিদ্রিত উপহাসে,
সেখানে যতই গাহি জয়গান—
ভরে না হৃদয়, জাগে না পরান
দলিত কুসুমে আবৃত উল্লাসে।

প্রিয় পতাকায় যাদের রক্ত ছিল,
প্রাণ দিয়ে তাকে ভালবেসেছিল যাঁরা,
কোথায় সেসব পতাকা নির্মাতারা ?
কোথায় পথের সরাই স্তম্ভগুলি ?
অশ্বারোহীর উড্ডীন পদধূলি
হাওয়ার ঘূর্ণিপাকে,
কেবলি রাতের ব্যর্থ বাহুতে
দিনের উল্কি আঁকে।

তারপর কোনো প্রাতে
হঠাৎ হাওয়ার সাথে,
নড়ে ওঠে বন কাঁপিয়ে গুল্মলতা,
বৃক্ষশাখায় নতুন সূর্য জাগে।

সীতাসম অনুরাগে—
প্রিয় পতাকার লাগি
জটায়ুর মতো রক্ত ঝরাতে
আমিও প্রহর জাগি।

রাজনীতি যেথা ইতিহাস-মোছা খেলা,
প্রগতি যেখানে পেছনে ফেরার ছল,
সেখানে ব্যর্থ হবে কি মানুষ ?
হবে কি ব্যর্থ বীরের বীর্য ?
মায়ের অশ্রুজল ?

আমার স্বর্গ

[শিশির দত্ত, শহীদুল হক মুগল-সন্দুর]

তুমি আমার চিতাভস্ম, মা।
তোমার একটি ধূলিকণাও আমি কাউকে দেবো না।

তোমার হাত শিকল দিয়ে বেঁধে,
যারা কুটিল ঘৃণ্য জাতিভেদে
তোমার দেহ দ্বিখণ্ডিত করে
আমি আগুন জ্বালি তাদের ঘরে।
বলি বালুয় শানিয়ে রাম দা :
তোমার একটি ধূলিকণাও আমি কাউকে দেবো না।

চোখের জলে সিনান করে তুমি
আমার হাতে দিলে যেটুক ভূমি,
তোমার দেয়া স্বর্গ মনে করে
সেটুক যেন রাখতে পারি ধরে।
সোনার ভরে তুলতে পারি গা।
তোমার একটি ধূলিকণাও আমি কাউকে দেবো না।

তোমার যত চাষের জমি আছে,
তোমার যত ফুল ফুটেছে গাছে,
তোমার যত আছে জলের নদী,
সমান করে লইতে পারি যদি।
সবাই মিলে বলতে পারি মা—
তোমার একটি ধূলিকণাও আমি কাউকে দেবো না।

সেদিন তোমার দুঃখ যাবে ঘুচে,
আমি তখন চোখের জল মুছে
এই কথাটি বলতে যেন পারি :
'তুমি আমার স্বর্গ ছিলে নারী।'

• • •

আমাদের জীবনের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে এক প্রচণ্ড নিষ্ঠুর হৃদয়হীন সমাজ। কুষ্ঠরোগীর গলিত পুঁজের দুর্গন্ধযুক্ত ন্যাকড়ার মতোই একে তীব্র ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করতে হবে। আমার এ কাব্যগ্রন্থ, আপনার উপর, ঘৃণা-জাগরূক এই সমাজকে প্রেম-জাগরূক সমাজে রূপান্তরিত করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করছে।

•

আমার এ কাব্যগ্রন্থ, যাবতীয় শোষণের নিগড় থেকে দেশের চাষাভূষাদের মুক্ত করার জন্য, আপনার উপর, এক সুমহান বিপ্লবী দায়িত্ব অর্পণ করছে।

•

আমার এ কাব্যগ্রন্থ, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃত মিলনেব সকল প্রতিকূল অবস্থার চির-অবসান-আকাঙ্ক্ষায়, আপনার উপর, এক ঐতিহাসিক মানবিক দায়িত্ব অর্পণ করছে।

•

আমার এ কাব্যগ্রন্থ, আপনার উপর, শোষক শ্রেণীর আশীর্বাদপুষ্ট গণ-বিরোধী, ক্লীব-নিরপেক্ষ তথা বুর্জোয়া শিল্পের যাবতীয় প্রতারক দর্শনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করার নৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করছে।

•

আমার এ কাব্যগ্রন্থ, আপনার হাতে অর্পণ করছে সর্বহারার ঐতিহাসিক মুক্তি-সনদ, সমাজতন্ত্রের প্রোজ্জ্বল পতাকা।